সম্পাদকীয়

স্বাধিকার ■ ৩০ জুন ২০০৫ ■ বুলেটিন নং ৩৩

পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সমস্যার সমাধান প্রসঙ্গে

গত ৮ জুন খাগড়াছড়িতে বিচারপতি এ এম মাহমুদুর রহমানের সভাপতিত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন প্রথমবারের মতো বৈঠকে বসে। ১৯৯৯ সালের ৩রা জুন এই কমিশন গঠিত হলেও এখনো পর্যন্ত কোন কার্যক্রম শুরু করেনি।

এই বৈঠকের একদিন আগে পার্টির উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রামে অব্যাহত ভূমি বেদখলের বিরুদ্ধে হাজার হাজার নারী পুরুষের মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সরকার-সেনাবাহিনী ও জনসংহতি সমিতির মিলিত ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও জনগণের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণের ফলে সমাবেশ সফল হওয়ায় যে বিষয়টি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে তা হলো ভূমি অধিকার প্রশ্নে জনগণ অত্যন্ত সচেতন এবং তারা এ অধিকার আদায় ও রক্ষার জন্য যে কোন মূল্য দিতে প্রস্তুত। সুতরাং সেই হিসেবে ভূমি বেদখল বিরোধী মহাসমাবেশে সকল শ্রেণী পেশার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ও দৃপ্ত অংশগ্রহণ সরকার ও কুচক্রী মহলের প্রতি একটি সতর্ক সংকেত: নানা উছিলায় জনগণের জমি কেড়ে নেয়া যাবে না, ভূমি সমস্যা সমাধানের নামে কোন ধরনের টালা বাহানাও সহ্য করা হবে না।

সন্দেহ নেই, পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা কিছুটা জটিল। জটিল হওয়ার কারণ প্রধানত দুইটি। এক, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিশেষ অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও এবং এখানকার জাতিসত্তাসমূহের স্বতন্ত্র ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও জীবনাচার সত্ত্বেও, পাহাড়িদের সমাজে ঐতিহ্যগতভাবে চলে আসা ভূমির ওপর যৌথ মালিকানার স্বীকৃতি না দেয়া। ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশ সংবিধানের ১৩ অনুচ্ছেদে কেবল তিন ধরনের মালিকানার কথা বলা হয়েছে, যেমন রাষ্ট্রীয় মালিকানা, সমবায়ী মালিকানা ও ব্যক্তিগত মালিকানা। সংবিধানে যেমন দেশের সংখ্যালঘু জাতিসত্তাগুলোর স্বীকৃতি নেই, তেমনি তাদের বিশেষ ভূমি মালিকানা পদ্ধতিরও কোন রক্ষাকবচ নেই। এর ফলে জাতিসত্তাগুলোর বংশ পরম্পরায় চলে আসা যৌথ মালিকানাধীন সম্পত্তি দেশের আইন দ্বারা সংরক্ষিত না হওয়ায় সেগুলো খাস জমি হিসেবে আখ্যায়িত করে সরকার এবং বহিরাগতদের দ্বারা প্রশাসনের সহায়তায় বেদখল করা সহজতর হয়েছে। বৃটিশ আমল থেকেই এই ধারা চলে আসছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে উপনিবেশ স্থাপনের পর বৃটিশরাই প্রথম নিজেদের স্বার্থে ব্যক্তি মালিকানা প্রথার প্রবর্তন করে ও একই সাথে ব্যাপক বনাঞ্চল নিজেদের অধিকারে নিয়ে নেয়।

সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও যুগান্তকারী পদক্ষেপ হবে পাহাড়ি জাতিসত্তাগুলোর যৌথ মালিকানার স্বীকৃতি দেয়া।

দ্বিতীয় যে পদক্ষেপ পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সহ সকল ক্ষেত্রে সমস্যার জন্ম দিয়েছে তা হলো জিয়াউর রহমানের শাসনামলে সরকারী উদ্যোগে অস্ত্র ক্ষমতার বলে কয়েক লক্ষ সমতলবাসী বাঙালীকে পুনর্বাসন। এর ফলে একদিকে যেমন মানবাধিকার পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটে ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়, অন্যদিকে তেমনি পাহাড়িদের নিজ জমি থেকে উৎখাত হওয়ার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয় এবং পাহাড়িদের পুরো জাতীয় অস্তিত্ব সাক্ষাত হুমকির মুখে পতিত হয়। প্রকৃতপক্ষে সেটলারদের অনুপ্রবেশের আগেই ৬০ দশকে কাপ্তাই বাঁধে ৫৪ হাজার একর জমি পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় চাষযোগ্য জমির অপ্রতুলতা তীব্র আকার ধারণ করেছিল। তার উপর আরো চার লক্ষ বাঙালীকে রাজনৈতিক হীন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য নিয়ে আসায় পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করে। কাজেই পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে যৌথ মালিকানার স্বীকৃতির সাথে সেটলারদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনক পুনর্বাসন অত্যন্ত জরুরী। এটা হবে সবার জন্য মঙ্গলজনক।

রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও প্রতিজ্ঞা থাকলে এইসব ষড়যন্ত্রের শিকার গরীব সেটলারদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসন করা কোন সমস্যা হতে পারে না। ফিলিস্তিনীদের গাজা উপত্যকা থেকে ৪০ বছর পর ইহুদী বসতিস্থাপনকারীদের সরিয়ে আনার শ্যারণের সিদ্ধান্ত সে কথাই প্রমাণ করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বেলায় এটা করা আরো বেশী সহজ। কারণ সেটলাররা নিজেরাই ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যে, সরকার তাদেরকে যেখানে পুনর্বাসন করবে তারা সেখানেই যাবেন। তাছাড়া কয়েক বছর আগে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট তাদের সমতলে পুনর্বাসনের জন্য অর্থ সাহায্য দিতে রাজী হয়েছিল।

সেটলারদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে যে কথা চরম দক্ষিণপন্থী মতবাদীদের কাছ থেকে বলা হয় তা হলো, বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। তাদের এই কথা অবশ্যই সত্য, কিন্তু যুক্তি হিসেবে তা অবান্তর। পৃথিবীর অনেক দেশ রয়েছে যেখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব বাংলাদেশের মতোই। এমনকি বাহরাইনে জনসংখ্যার ঘনত্ব বাংলাদেশের চাইতে বেশী।

সেটলারদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেয়া হলে চরম দক্ষিণপন্থী ও সাম্প্রদায়িক শক্তির দিক থেকে স্বাভাবিকভাবে কিছুটা প্রতিবাদ আসতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিক প্রতিজ্ঞা থাকলে সেটা মোকাবিলা করা অসম্ভব কিছু নয়। সবচেয়ে বড় কথা হলো সেটলারদেরকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার বন্ধ হবে এবং ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলো তাদের অস্তিত্বের হুমকি থেকে রক্ষা পাবে। অর্থনৈতিকভাবেও বাংলাদেশ লাভবান হবে। কারণ এতে করে সেটলারদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামে রাখার জন্য যে কোটি কোটি টাকার ফ্রি রেশন দেয়া হয় তা বেঁচে যাবে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা জিইয়ে রাখার জন্য সামরিক খাতে দৈনিক বাড়তি যে দেড় কোটি টাকা খরচ হয়, তাও সাশ্রয় হবে। এছাড়া, পাহাড়ি বাঙালী সম্প্রীতি ফিরে আসবে এবং সরকার ও দেশের ভাবমূর্তিও উজ্জ্বল হবে।

আমাদের প্রত্যাশা, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সমস্যার সমাধান তথা অত্র অঞ্চলে প্রকৃত শান্তি ও উন্নয়নের স্বার্থে উপরোক্ত বাস্তবসম্মত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করবে। তা না হলে সমস্যা গভীর থেকে গভীরতর হবে যা কারোর কাম্য হতে পারে না।

সাবধান! দেশে এখন বেগম অরাজকতার সরকার!!

সত্যদর্শী

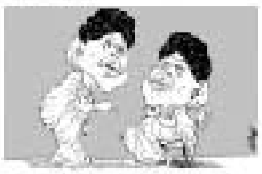

সৌজন্যে: সাপ্তাহিক হলিডে

এ হলো ভয়াবহ অরাজকতার কিছু স্ন্যাপ শট মাত্র। বেগম অরাজকতার রাজত্বের সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরতে গেলে কয়েকটি মহাকাব্য লেখা যাবে।

দেশে এখন কার সরকার ক্ষমতায় আসীন? যারা সিনিক বা নিরাশাবাদী তারা বলবেন দেশে এখন কোন সরকার ক্ষমতায় নেই। দেশে এখন যা চলছে বা যেভাবে দেশ চলছে তাতে এরকম মনে হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু আমার মতে তাদের এ কথা সত্য নয়। দেশে অবশ্যই একটি সরকার ক্ষমতায় রয়েছে। আর তা হলো বেগম অরাজকতার জোট সরকার।

তো এ সরকারের রাজত্ব কি রকম? প্রথমেই স্মরণ করা দরকার সত্তর দশকের মধ্যভাগে বেগম সাহেবার পুরুষ মানুষটি সেনানায়কের পোষাক ছেড়ে রাজনীতি করতে এসে কি বলেছিলেন। "আই উইল মেক পলিটিক্স ডিফিকাল্ট", বলেছিলেন তিনি। অবশ্য তিনি রাজনীতি কতটুকু ডিফিকাল্ট করতে পেরেছিলেন সেটার বিচার এই লেখার বিষয়বস্তু নয়। তবে সে সম্পর্কে এটা বলা যায় জেনারেল সাহেব ষড়যন্ত্র চক্রান্ত ও হর্স ট্রেডিং এর মাধ্যমে বাম, মধ্য বাম, ডান ও চরম ডানপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে সেখান থেকে লোক জড়ো করে নিজের পার্টি গঠন করেছিলেন। সেই পার্টিরই যোগ্য উত্তরাধিকারী হলেন জেনারেলের বেগম অরাজকতা, যার রাজত্বে এখন বাংলাদেশ চলছে।

নিজের স্বার্থে অন্যের পার্টি-সংসার ভেঙ্গে দেয়ার যে ঐতিহ্য, বেগম অরাজকতা এখন তা রক্ষা করতে যেন উঠে পড়ে লেগেছেন। যেখানে জেনারেলটি পলিটিক্সকে ডিফিকাল্ট করতে চেয়েছিলেন, সেখানে একবিংশ শতাব্দীতে এসে তার বেগম যেন প্রতিজ্ঞা করেছেন: আই উইল মেক পলিটিক্স ডার্টি। অবশ্য পলিটিক্স ডার্টি করার খেলায় যিনি সবচেয়ে বেশী পারঙ্গম তিনি হলেন অন্য এক জেনারেল, যার নাম হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ। রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনের এমন কোন জায়গা নেই যেখানে জেনারেল এরশাদের কদর্য হাতের স্পর্শে কলুষিত হয়নি। এখন বেগম সাহেবা কদর্য রাজনীতির চর্চায় তার সাথে পাল্লা দিতে যেন শাড়ির আঁচল কোমড়ে বেঁধে নেমে পড়েছেন। বেগমের কদর্য রাজনীতির খেলার কেন্দ্রবিন্দুও হলেন স্বয়ং এরশাদ ও তার পরিবার। সুতরাং খেলা জমে ওঠাটা খুবই স্বাভাবিক।

যাই হোক, নোংরা রাজনীতির পঙ্কে এরা যত পারে ডুবে থাকুক। তাতে আপত্তি বিশেষ করার নেই। তবে বেগম অরাজকতার রাজত্বে দেশের কি অবস্থা সেটা একটু দেখা দরকার।

শীতল যুদ্ধের সময় আমেরিকার ধুরন্ধর পররাষ্ট্র মন্ত্রী হেনরী কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি আখ্যা দিয়েছিলেন - এটা বহু পুরোনো কথা। এর মধ্যে বাংলাদেশের নদনদী দিয়ে অনেক পানি গড়িয়ে গেছে। গরীব দেশটির মসনদে যারাই বসেছে তারাই দেশটাকে আখের রস মনে করে চিবিয়ে খেয়েছে। এই শাসকগুলোর গত ৩৫ বছরের রাজত্বে দেশটা একেবারে "ছ্যাবড়া ছ্যাবড়া" হয়েছে। কেবল বর্তমান সরকারের আমলে বাংলাদেশ দুর্নীতিতে পর পর তিন বার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের খেতাব অর্জন করেছে। মবুতুর কঙ্গোসহ (আগের নাম জায়ার) আফ্রিকার বেনানা রিপাবলিকগুলোর (Banana Republics) সাথেই কেবল বর্তমান বাংলাদেশের তুলনা চলে। দুর্নীতি দেশে এখন আইন দ্বারা স্বীকৃত। বাজেটে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ আরো এক বছর বৃদ্ধি করার অর্থ কি এটা বোঝায় না? সুতরাং স্বাধীন দুর্নীতি কমিশন গঠন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে এক হাত দেখিয়ে নেয়ার জন্য দিনভর বাগাড়ম্বর সবই ভাওতাবাজি। যেখানে সর্ষের মধ্যে ভূত, সেখানে কোন মন্ত্রজপ অর্থহীন প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

দুর্নীতি কেবল যে গভর্নেন্স বা প্রশাসন কার্যক্রমের মধ্যে সীমিত তা নয়। যেখানে দুর্নীতি শাসকগোষ্ঠিগুলোর কালচারে পরিণত হয়েছে, সেখানে তা সমাজ জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও যে ঢুকে পড়বে সেটাই তো স্বাভাবিক। শাসকগোষ্ঠির সংস্কৃতিই সমাজের প্রভাবক সংস্কৃতি। সুতরাং ব্যবসা বাণিজ্য থেকে নিয়ে দৈনন্দিন ছোট খাট লেনদেনের মধ্যেও অসততা ও অসাধুতা এখন যেন প্রভাতে সূর্য ওঠার মতোই স্বাভাবিক ও শাশ্বত। ভোগ্য পণ্যে ভেজাল মেশানোর খবর হররোমেশা পত্রিকায় ছাপা হয়। দেশে এখন এমন কোন জিনিস নেই যেটাতে ভেজাল মেশানো হয় না। এমনকি যেটা না হলে চলে না সেই চাল পর্যন্ত দুই নাম্বারী করা হয়েছে। ইউরিয়া সার মিশিয়ে চাউল সাদা করা হচ্ছে। এছাড়া, নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্য যেমন ডাল, লবন, চিনি, গুড়া মরিচ, তেল ইত্যাদিতে ভেজাল মেশানো হচ্ছে অহরহ। শাক সব্জি, কাঁচা তরিতরকারী ও ফলমূলেও রয়েছে ভেজাল। দেশে অনেকে খাদ্য খেতে না পেয়ে মারা যাচ্ছে, খাদ্য খেয়েও মারা যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশ সত্যি এখন বসবাসের জন্য বিপজ্জনক।

যাই হোক, ভেজাল খাদ্য খেয়ে না হয় তেমন কিছুই হলো না। কারণ গরীবের পেটে অনেক কিছু হজম হয়। কিন্তু তাই বলে কি বিপদমুক্ত থাকা গেল? ঢাকার রাস্তায় চলাফেরা করাটাও এখন কম বিপজ্জনক নয়। গত ২৮ মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী সাম্মি আখতার হ্যাপির গাড়ি চাপায় করুণ মৃত্যু ও তার পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস এলাকায় পুলিশের বর্বরতা তার সাক্ষী। পুলিশ কেবল ছাত্রছাত্রীদের পেটায়নি, পথচারীদেরও রেহাই দেয়নি। পরে ভিসির পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনরত সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ওপর ছাত্রদলের কর্মিরাও চড়াও হয়। পুলিশের সহায়তায় ছাত্রদল পুরো ক্যাম্পাস দখল করে নেয়।

নৈরাজ্য কেবল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নয়, সর্বত্র। ফুটপাত থেকে শুরু করে দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয় হাইকোর্ট পর্যন্ত। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সমর্থিত আইনজীবীদের মধ্যে উত্তেজনা, বার কাউন্সিল ও সুপ্রীম কোর্টের মধ্যে দ্বন্দ্ব, আদালত বর্জন, আদালত প্রাঙ্গনে সভাসমাবেশের ওপর কোর্ট রুলিং ইত্যাদিতে হাইকোর্ট প্রাঙ্গন বেশ কিছুদিন ধরে ছিল উত্তপ্ত।

অপরদিকে, র‌্যাবের ক্রসফায়ারের কিস্সা-কাহিনী প্রতিদিন সংবাদ পত্রের পাতায় বিরামহীনভাবে ছাপা হচ্ছে। কথিত ক্রসফায়ার ও হেফাজতি খুন দেশ বিদেশের মানবাধিকার সংগঠন, রাজনৈতিক দলসহ সকল মহল ও এমনকি ইউরোপীয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশের কূটনীতিকদের অব্যাহত কড়া সমালোচনার মুখে পড়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সরকার নির্বিকার। সারা দেশে যেন জঙ্গলী রাজত্ব কায়েম হয়েছে। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের আইনী ব্যবস্থায় একটি অন্যতম স্তম্ভ হলো প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্তকে নির্দোষ মনে করা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ক্রসফায়ার খোদ এই আইনী প্রবাদটির মূলেই আঘাত হেনেছে। বিচারের আগেই অভিযুক্তকে "সন্ত্রাসী" বলে রায় দিয়ে ক্রসফায়ারের নামে ফাঁসি দেয়া হচ্ছে। বিশ্লেষকদের মতে, সন্ত্রাস দমন নয়, বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মিদের শায়েস্তা করাই র‌্যাব গঠনের উদ্দেশ্য। কারণ ইতিমধ্যে অনেক রাজনৈতিক নেতা কর্মি ও এমনকি সাধারণ লোকজন পর্যন্ত র‌্যাবের হাতে খুন হয়েছেন।

এদিকে যারা প্রাণে বেঁচে আছেন তাদের অবস্থাও যেন "মরণ হলেই বাঁচি।" নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম দফায় দফায় বেড়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি সরকারী কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির পর এক দফা ও সংসদে বাজেট পেশের পর আরো এক দফা - মোট দু' দফা বাড়লো। এ বৃদ্ধিতে সবচেয়ে বেশি জখম হয় গরীব ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো। এখন বর্ষাকাল। প্রতি বছরের মতো বন্যা হলে জিনিসপত্রের দাম যে আরো এক দফা বেড়ে যাবে সেটা সবার হিসেবের মধ্যে। দ্রব্য মূল্যের এ লাগামহীন উর্ধ্বগতিতে সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই।

এ হলো ভয়াবহ অরাজকতার কিছু স্ন্যাপ শট মাত্র। বেগম অরাজকতার রাজত্বের সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরতে গেলে কয়েকটি মহাকাব্য লেখা যাবে। ■